যদু ভট্ট

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের ভট্টপাড়ায় (বর্তমান নাম বৈদিক পাড়া) বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে সর্বভারতীয় স্তরের প্রথম শ্রেণীর বাঙালী ধ্রুপদীয়া যদুভট্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল যদুনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন একাধারে ধ্রুপদগায়ক, ধ্রুপদ রচয়িতা ও সুরকার। তাঁর পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে সেতার ও সুরবাহার বাদকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ তাঁর কাছে বেশ কিছুদিন সেতার বাদনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

সাংগীতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করার ফলে যদুনাথের সংগীতবিদ্যার উপর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বাল্যকাল থেকেই যদুনাথ পিতার কাছে সেতার, সুরবাহার ও পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্র বাদনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্য রামশংকর ভট্টাচার্য-র বাড়ি ছিল মধুসূদন ভট্টাচার্য-র বাড়ির পাশেই। নিজের ঘর থেকেই সংগীতাচার্যর সুরের ধ্বনি যদুনাথের

কর্ণগোচর হতো। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। কাজেই সহজেই তিনি সংগীতাচার্যের নিজের গায়ন শৈলী ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। যদুনাথের অনুকরণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে ৮০ বৎসর বয়সোর্ধ সংগীতাচার্য তাঁকে সংগীত শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মধ্যে যখন সংগীতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সেই সময় ৯২ বৎসরের সংগীতাচার্য-র দেহবসান ঘটেছিল। সেই সময়ে সংগীত গুরু ও সংগীতগুণী রামশংকরের দেহ যখন মল্লেশ্বরের প্রাঙ্গণে পৌঁছেছিল তখন মাত্র ১৩ বৎসরের বালক যদুনাথ সকল দর্শনার্থীর সংগে এসে সংগীতের অমৃত রস দাতা গুরুর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে সর্বহারার মত তাকিয়েছিলেন। গুরুকে হারানোর জন্য তাঁর সংগীত শিক্ষায় ছেদ পড়েছিল। পিতার নির্দেশানুসারে বিদ্যালয়ে গেলেও অতৃপ্ত যদুনাথ বিদ্যালয় শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। কলিকাতায় বহু সংগীতগুণীর সমাগম হয়ে থাকে শুনে ১৫ বৎসর বয়সে বিষ্ণুপুর থেকে যদুনাথ একাই কলিকাতায় চলে এসেছিলেন সংগীত শিক্ষার ইচ্ছায়। এই সময় সহায়সম্বলহীন যদুনাথকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। জীবন ধারণের জন্য তাঁকে পাচকের কাজও করতে হয়েছিল।

মনের অদম্য ইচ্ছা ও গুরু আশীর্বাদে বালক যদুনাথ একদিন নতুন গুরু লাভ করেছিলেন। তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ বাংলার ধ্রুপদীয়া গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। যদুনাথের সংগীত শুনে মুগ্ধ হয়ে গঙ্গানারায়ণ মশাই তাঁর উত্তর কলিকাতার বলরাম দে ষ্ট্রীটের বাড়িতে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে সংগীত শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। বেশ কয়েক বৎসর গুরুর কাছে খণ্ডার বাণীর ধ্রুপদ শিক্ষা করে তিনি এই সংগীতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

এরপরে যদুনাথ পশ্চিমাঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সংগীত কেন্দ্রে, দরবারে নিজে যেমন তাঁর সংগীত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তেমনি বিভিন্ন সংগীতগুণীর সান্নিধ্যে এসে তিনি নানা ঘরাণার সংগীতে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। এইভাবে তিনি একদিন সংগীত সমাজের কাছে যদুভট্ট নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

বিভিন্ন ঘরাণার সংগীতকে আত্মস্থ করলেও তাঁর গায়ন-পদ্ধতি ছিল অন্য স্বাদের। স্বাতন্ত্রতাই ছিল তাঁর সংগীতের বৈশিষ্ট্য। খাণ্ডার বাণীর গমক প্রধান ব্রজভাষার ধ্রুপদ গান যখন তিনি পরিবেশন করতেন পূর্বাঙ্গে ও উত্তরাঙ্গে

সমভাবে তাঁর কণ্ঠে সুর বিহার করতো।

তিনি গায়ন ক্রিয়াতে গমকের কাজ খুব বেশী প্রদর্শন করতেন। গমক প্রধান পশ্চিমী বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ধ্রুপদ পরিবেশন ছাড়াও স্বরচিত বাংলা ধ্রুপদ গানও তিনি পরিবেশন করতেন। নিজস্ব রচনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গায়কীতে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায় যে, 'ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরী হতে পারে, যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্ত রচিত।' এই মহান স্বীকৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যদুভট্টকে প্রকৃত সংগীতগুণীর আসনে বসিয়েছিলেন।

কিশোর বয়সের সংগীতগুরু রামশংকর ভট্টাচার্য-র গীত রচনা, সুর রচনার প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হয়ে যৌবন বয়সে এসে যদুভট্ট হয়ে উঠেছিলেন গীতিকার ও সুরকার। তাঁর রচিত হিন্দী ও বাংলা ধ্রুপদ গান ছিল উচ্চস্তরের। এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে তাঁর রচিত গানের অনুসরণে ও অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ বহু সংগীত রচনা করেছিলেন। এ থেকে যদুভট্টের রচিত গানের কাব্য গুণ যথেষ্ট ছিল বলেই নিশ্চিত হওয়া যায়। তাঁর রচিত গানের বেশীরভাগই মুদ্রিত না হওয়ায় হারিয়ে গিয়েছে। অন্য গানগুলি সংকলন গ্রন্থে সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর এই সহজাত কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে একটি ঘটনা শোনা যায়। ত্রিপুরার রাজসভায় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রবাবী ও বীণকার কাসিম আলী খাঁ (তানসেনের পুত্র বংশীয়) একদিন কয়েকটি রাগের আলাপ বাজিয়েছিলেন। বাজনা শেষে যদুভট্ট প্রত্যেকটি রাগে গান রচনা করে সুর সংযোজন করে সংগে সংগে পরিবেশন করেছিলেন।

যদুভট্টের পারিবারিক জীবনের কথা তেমনভাবে কিছু জানা যায়নি। শুধু জানা যায় যে, তিনি ২৬/২৭ বৎসর বয়সে ২৪ পরগনা জেলার কাঁচরাপাড়ায় বিবাহ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর দেহবসানের পরে তাঁর পৈত্রিক ভিটাও জন্মস্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংগে পরিচয় যদুভট্টের জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়। মহর্ষির পৃষ্ঠপোষকতায় যদুভট্ট জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ীতে থেকে পরিবারের সংগীত শিক্ষকের ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মিত গায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর ফলে যদুভট্টের অশান্ত ও অনিয়মিত জীবন শান্ত ও নিয়মাবদ্ধ হয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের সংগীত চর্চাকে তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।

এছাড়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যদুভট্ট সমাজ মন্দিরের সংগীত বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে থাকাকালীন ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মহারাজ যদুভট্টের সংগীত শুনে তাঁকে ত্রিপুরার সভাগায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। মহারাজ ছিলেন যদুভট্টের অত্যন্ত গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক। তিনি তাঁকে 'তানরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। যদুভট্ট মহারাজের প্রশস্তি বাচক কিছু গানও রচনা করেছিলেন। বেশ কয়েক বৎসর তিনি ত্রিপুরায় ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও গায়নরীতির জন্য সেখানে সংগীত সমাজে ধ্রুপদ সংগীতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। যদুভট্টের গানের প্রেরণায় সেখানকার বহুগুণী যাত্রা গায়ক বিভিন্নস্থানে ধ্রুপদ গান পরিবেশন করে এই গানের প্রচার করেছিলেন।

যদুভট্ট বেশ কয়েকবৎসর বর্ধমান-রাজ মহাতপচাঁদের রাজ দরবারের সভা গায়ক পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ-কে উদ্দেশ্য করেও তিনি সংগীত রচনা করেছিলেন।

পঞ্চকোট রাজ্যের রাজা নীলমণি সিংহ যদুভট্ট-কে সভা গায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি তাঁকে 'রঙ্গনাথ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন (এক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় যে 'রঙ্গনাথ' নামে অপর একজন বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গায়কের নাম পাওয়া যায়)

যদুভট্টের শিষ্য গঠনের বিষয়ে বলা যায় যে, তাঁর সংগীত জীবনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি জীবন ছিল অশান্ত। কোথাও তিনি স্থায়ীভাবে বেশীদিন থাকতেন না। তাই তেমনভাবে শিষ্য গঠন করতে না পারলেও তাঁর সংগীত জীবনে শিষ্য প্রসঙ্গ ছিল সত্যিই গৌরবময়। কিশোর রবীন্দ্রনাথ নিয়মমাফিক ভাবে সংগীত শিক্ষা না নিলেও যদুভট্টের সংগীত তাঁকে যে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তীকালের রচনার মধ্যে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত পাখোয়াজ বাদক এবং যদুভট্টের গানের সঙ্গতকার জগৎচাঁদ গোস্বামীর অনুরোধে তাঁর পুত্র উত্তর-কালের সংগীতগুণী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকেও যদুভট্ট ধ্রুপদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ত্রিপুরায় থাকাকালীন বাংলার একজন সংগীতগুণী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-কেও তিনি ধ্রুপদ সংগীতের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এছাড়া, যদুভট্ট তাঁর মধ্য জীবনে বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শিষ্যরূপে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যদুভট্টের থেকে ২ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম'

গানটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র-র পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র-র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়া ভবনে যদুভট্ট এই গানটি প্রথম সুরে-তালে গঠন করে নিজে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। উল্লিখিত শিষ্যগণ ছাড়া যদুভট্টের আরো একজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। তিনি কৃষ্ণনগরের শশিভূষণ কর্মকার। তিনিও যদুভট্টের কাছে ধ্রুপদ সংগীত শিক্ষা করেছিলেন।

ত্রিপুরার দরবারে থাকাকালীন যদুভট্ট অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি কাঁচড়াপাড়ায় শ্বশুরালয়ে চলে এসেছিলেন। কিন্তু দিনে দিনে তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়েছিল। ছোট বয়সে দেখা গুরু রমাশংকরের মৃত্যু দৃশ্য তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে জীবনের শেষ সময়ে তিনি বিষ্ণপুরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর ইচ্ছানুসারে ত্রিপুরা থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল বিষ্ণুপুরে তাঁর পৈত্রিকভিটাতে। দিনে দিনে তাঁর শারীরিক অবস্থা আরো খারাপ হতে শুরু করেছিল। অবশেষে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে সংগীতগুণী যদুনাথ ভট্টাচার্য পরলোক গমন করেছিলেন।

যদুভট্টের উত্তম গায়ন পদ্ধতি, উচ্চমানের গীত রচনা ও সুর সংযোজনের জন্য বাংলা তথা সর্বভারতীয় নিরিখে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বাগ্‌গেয়কার রূপে সংগীত সমাজে আজও স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়ে রয়েছেন।